‘পথের দিশা দাও গো মুর্শিদ পথের দিশা দাও’

বাজেট-পরবর্তী আলোচনা এখনও বেশ জোরেশোরে চলছে। জীবন সায়াহ্নে এসে আমার গানের স্মৃতিচারণও বেড়ে যাচ্ছে। গানের পরবর্তী লাইনটা আরো সুন্দর। ‘আমি পথ হারাইয়া কান্দি পথে আমায় তুইলা নাও, মুর্শিদ পথের দিশা দাও...।’ এদেশের কর্মকাণ্ড, যোগ্য (?) ব্যক্তিদের মন-মানসিকতা দেখলে জীবনের শেষ-বিকেলে আনমনে এরকম অনেক গানের কথা মনে হয়। বিগত ১৬ জুন ২০২৩ গুলশানের এক হোটেলে এক বাজেট-পরবর্তী আলোচনায় কথা বলতে হলো। আমি সব সময় বাজেটের অন্তর্নিহিত বিশ্লেষণকে পছন্দ করি। উপস্থিত কেউ কেউ বললেন, বর্তমান আলোচনার ভিত্তিতে বাজেট সংশোধনের সময় আর নেই, পরবর্তী বছর বিবেচনায় নিতে পারে। আসলে বাজেটের আলোচনা কোনো নির্দিষ্ট মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। নানাজনের আলোচনা থেকে বুঝি, এদেশে বাজেটকে আমরা সরকারি ‘জমা-খরচের হিসাব’ বলে বিবেচনা করি এবং সেমতো অনেকেই মৌসুমি সমালোচনা করি। বিষয়টা আদৌ তেমন নয়। বাজেট দক্ষ দেশ-পরিচালকদের হাতে দেশের পুরো কর্মযজ্ঞের সুদক্ষ কর্ম-পরিকল্পনা এবং বাজেটের মাধ্যমে সরকারের কর্মে নিয়োজিত জনসম্পদের সারা বছরের কর্ম ও সেবার সুবিজ্ঞ নিয়ন্ত্রণ। দুঃখের বিষয়, বাজেটকে পুরো দেশের কর্মযজ্ঞের পরিকল্পনা, মূল্যায়ন ও নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের অভ্যাস ও সক্ষমতা আমাদের ব্যবহারকারিদের নেই। বাজেটের পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ একটা বিলের পানিতে বিলব্যাপী জন্মানো কলমিলতার মতো। কোনো এক কূলের একটা লতা ধরে টানলে পুরো বিলের কলমিলতার পাতা মাথা নাড়ে। বাজেট মূল্যায়নে আমরা সরকারি জনসম্পদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনের মাত্রা পরিমাপ করতে পারি; সরকারি, আধাসরকারি ও অনেক বেসরকারি বিভাগ থেকে গৃহীত সেবা ও সেবার মানকে বিশ্লেষণ করতে পারি। সরকার যদি থাকে, দেশ যদি থাকে, বছরব্যাপী বাজেটও থাকতে হবে; থাকতে হবে বাজেটীয় নিয়ন্ত্রণ। ভাগ্য ভালো, আমরা সে সংস্কৃতিতে গড়ে উঠিনি। নইলে বাজেট মূল্যায়নের ফলে এদেশের অনেক দুর্নীতি, ভাওতাবাজি, মিথ্যাচার, মুখে মধু পেটে বিষ, জিভ উল্টানো বন্ধ হয়ে যেত। কোনো কোনো বাজেট আলোচনায় কথার মধ্যে আমি স্পষ্টভাষী হবার কারণে এসব বাস্তবতা তুলে ধরতে গিয়ে প্রায়শই ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়, কর্তাভজা সম্প্রদায়ের কুদৃষ্টিতে পড়তে হয়। তাদের অলিখিত নির্দেশনা এরকম: কোরাস বেঁধে ‘শ্রীচৈতন্যের’ নাম ধরে সশব্দে ‘চৈতন্যগীত’ গাইতে হবে। আমার বক্তব্যও পরিস্কার: শিক্ষকতা পেশায় থেকে ব্যক্তিগত সুবিধালাভের জন্য উগ্র দলবাজি এড়িয়ে চলাই ভালো; একজন শিক্ষকের অন্তত দুচোখ মেলে দেখার অভ্যাস থাকতে হবে।

বাজেটের মধ্যে ‘আমি বাহির পানে চোখ মেলেছি, ভিতর পানে চাইনি’ বললে হবে না। দেশ পরিচালনায় অসুবিধার মূল কোথায়, অতীত-বাজেটের মধ্যে খুঁজে বের করতে হবে। যে কোনো কিছুর উন্নতি করতে গেলে আগে তার ঘাটতিগুলোকে চিহ্নিত করতে হয়। সুতরাং ‘চৈতন্যগীত’ গেয়ে পক্ষ-বিপক্ষ ভাবার কোনো কারণ নেই। এদেশে এই রেওয়াজ খুবই ক্ষতির কারণ হচ্ছে। পত্রিকায় লেখার কারণে যেহেতু আমাকে অনেক বাড়তি প্রশ্নের সম্মূখীন হতে হয়, পত্রিকার মাধ্যমেই সেগুলোর উত্তর দিতে চাই; তাই এসব বাড়তি কথার অবতারণা।

এদেশে রাজনীতিও একটা লাভজনক পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনীতি থেকে সমাজের সুশিক্ষিত ও সত্যবাদী লোক ক্রমশই দূরে সরে যাচ্ছে, এজন্য এ অবস্থা। এদেশে ‘চৈতন্যগীতি’র রেওয়াজ সেই স্বাধীনতার পর থেকেই বেপরোয়াভাবে শুরু হয়েছে। সময় অতিক্রমণে একটু বেড়েছে বলা যায়। দলবাজি করা, দলীয় আদর্শে বিশ্বাস করা, আর কর্তার নামে ‘জিগির’ তোলা এক কথা নয়। যারা স্বার্থ হাসিল করতে চান, ‘জিগির’ তারাই তোলেন।

রাজনীতিতে, অফিস-আদালতে, সমাজে এই রেওয়াজ দলমত নির্বিশেষে আমাদেরকে বেশি বেকায়দায় ফেলে দিচ্ছে। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের যে কেউ পদে বহাল থাকার জন্য বা পদে যাওয়ার জন্য ক্ষমতাধর বা সম্ভাব্য দলীয় কর্তাকে দৃষ্টিকটুভাবে অপ্রাসঙ্গিক তেলবাজি করেন। এতে ব্যক্তির লাভ, পরিবেশ ও দেশের ক্ষতি। তাদের ঘটে তেলের ভান্ডার ছাড়া দেশকে দেবার কোনো মেধা ও যোগ্যতা নেই। নেই কোনো পরিবেশ-পরিস্থিতির বাচবিচার, নেই দেশ ও সমাজ উপকৃত হয় এমন কোনো কাজ; কেবলই নির্ভেজাল কর্তাভজন। কর্তা দাঁড়িয়ে কীর্তন গাইলে কর্তাভজা সম্প্রদায় পাক দিয়ে নাচে। এভাবে নিরঙ্কুশ কর্তাভজনে কর্তা দেশের ভালো-মন্দ কাজ বুঝতে পারেন না, কোন পথটা সঠিক, তাও নির্ধারণ করতে পারেন না। পরিণামে কর্তার হুঁশ ফিরলেও করার আর কিছুই তখন থাকে না। কর্তাভজা সম্প্রদায় ও কর্তাভজন এদেশের একটা বড় ব্যামো।

আমি মাস্টারমানুষ হওয়াতে শিক্ষা-কূলের কথা বেশি বলি। বড় বড় উচ্চমার্গের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কূলীন-পুরোহিতরা তো এভাবে কর্তাতোষণ করেই কাজে যোগ দিয়েছেন। কর্তাভজন করেই টিকে আছেন। এদেশে শিক্ষামান ও শিক্ষাব্যবস্থার কতটুকু উন্নতি করতে পেরেছেন? আত্মজিজ্ঞাসা কোথায়? জবাবদিহিতার রেওয়াজ এদেশে আছে কি-না?। 'মহান রাজনীতিবিদ'দের কাছে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের গুরুত্ব অনেক বেশি। যদিও এদেশে দুচোখওয়ালা স্পষ্টভাষী মাস্টারসাহেবদের প্রয়োজনও কম নয়। এরা যা বলেন, দেশের জন্য ভালো ভেবেই বলেন।

ঢাকার রাজপথের ঘটনা। পথের ধারে রিক্সা ভ্যানের উপরে কলা রেখে একজন বিক্রি করছেন। আমি যানবাহন থেকে নেমে কলা বিক্রেতার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। কলার দাম জিজ্ঞেস করলাম। দাম কমাতে বলায় কথাপ্রসঙ্গে তার কাছে শুনলাম, রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে তিন ঘণ্টা ধরে কলা বিক্রি করতে স্থানীয় 'রাজনৈতিক মস্তান'কে প্রতিদিন দুইশ টাকা চাঁদা দেওয়া লাগছে। এভাবেও দ্রব্যমূল্যের দাম বাড়ছে। সে এভাবে মাসের পর মাস চাঁদা দিয়ে কখনো কলা, কখনো আম, কখনো পেয়ারা ইত্যাদি বিক্রি করে সংসারের ঘানি টানে। সে যে খারাপ শব্দগুলো আমাকে আপন ভেবে বললো, অশালীন হবে বিধায় উল্লেখ করতে চাইনে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পুরোহিতরা শিক্ষার উন্নতির কাজে ব্যস্ত নেই বুঝলাম। কীসের উন্নতি করছেন? একদণ্ড চোখ বুজে ভেবে দেখি তো, আইনের শাসন এদেশে আছে কী-না? এক বছর পরেই আইনের শাসন এদেশে ফিরে আসবে কী-না? আমি দীর্ঘ বছর ধরে এমনই শতেক অনিয়ম, আইনহীনতা দেখে আসছি; কর্তাভজা সম্প্রদায়ের ভজন গাওয়া শুনে আসছি। এই একটা কারণেই এদেশের ক্ষুদ্র শিল্প দীর্ঘদিনেও বিস্তার লাভ করতে পারেনি। অনেক বড় বড় সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিলীন হয়ে গেছে। বাজেট আলোচনায় কি এগুলো আসতে পারে না? যাহোক, যে কথাগুলো ঐদিন বাজেট আলোচনায় বলিনি, তা এখানে সাদামাঠাভাবে বলতে চাই।

আলোচনায় মূল কথা একটাই: কয়েক বছরে বাজেট বরাদ্দ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন খাতে বরাদ্দের কোনো কমতি নেই, ঘাটতিও নেই। ঘাটতি– বাজেট বাস্তবায়নে, মানবসম্পদে, বাজেট বরাদ্দের বিনিময়ে যা অর্জন করি সেই কর্মে; ঘাটতি সেবা অর্জনে। পরিচালন ব্যয় বাবদ বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী সেবা অর্জন হচ্ছে না। এদেশে এটা একটু ভিন্নধর্মী আলোচনা। বাজেট তো বার্ষিক উন্নয়নের রূপরেখা, তাহলে বাজেট পথের দিশা দিচ্ছে না কেন? নিশ্চয় বাজেটে সুষ্ঠু পরিকল্পনা, বিশ্লেষণ ও নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার অভাব। নিশ্চয় বাজেট যা বলে তা আমরা বুঝিনে, কিংবা বুঝেও নির্দেশনা মতো কাজ করিনে। বাজেটের কমবেশি ৬২ শতাংশ পরিচালন ব্যয়। ব্যয়ের বিনিময়ে কমপক্ষে যদি এর সমপরিমাণ সেবাও এদেশ অর্জন করতো, দেশের প্রভূত উন্নতি হতো। এ হিসাব আমরা

সাধারণত করিনে। আমরা সবাই জানি, এক সম্পদ সময়ের অতিক্রমণে আরো সম্পদ বাড়ায়। আমরা শুধু দৃশ্যমান সম্পদই চোখে দেখি, ব্যায়ের বিনিময়ে অর্জিত কর্ম ও সেবাও দেশের জন্য সম্পদ– এটা ভাবিনে। শিক্ষা বিভাগ নিয়ে একটা উদাহরণ দেবো। আগামী অর্থবছরে শিক্ষার জন্য ৮৮ হাজার ১৬২ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। অনেকে এ বরাদ্দকে গত বছরের তুলনায় কিংবা জিডিপি-র তুলনায় অপ্রতুল বলবেন। তাহলে বেশি বরাদ্দ দিলে কি শিক্ষার মান ও উন্নয়ন বেশি হতো? বাস্তবতা কী বলে? এদেশে সরকারি-বেসরকারি মিলে কমপক্ষে ১৫০টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, আছে অগণিত টেকনিক্যাল কলেজ, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, মেডিক্যাল কলেজ, মেডিক্যাল টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, সাধারণ স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসা। শহরে, গ্রামে-গঞ্জে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোনো অভাব নেই। তারা আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন দক্ষ টেকনিক্যাল গ্রাজুয়েট ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরি করতে পারছে কী-না? যদি না পারে, ধরে নিতে হবে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে কর্মরত জনশক্তি বাজেট বরাদ্দের বিনিময়ে কাঙ্ক্ষিত সেবা দেশকে দিতে পারছে না। জনসম্পদ হিসেবে শিক্ষার্থীর মান যার-পর-নাই নিম্ন। প্রায় ক্ষেত্রেই সার্টিফিকেটসর্বস্ব শিক্ষা। বিদেশে শিক্ষিত, দক্ষ ও টেকনিক্যালি সক্ষম জনগোষ্ঠীর প্রচুর চাহিদা। এই অধিকাংশ নিম্নমানের অদক্ষ জনগোষ্ঠী বিদেশে রপ্তানি করে কেউবা হচ্ছে উটের রাখাল, কেউবা ড্রেন-ক্লিনার; কারো ভূমধ্যসাগরে নৌকাডুবিতে সলিল সমাধি হচ্ছে। খুব কম সংখ্যক লোক বিদেশে গিয়ে আশানুরূপ বেতনে চাকরি করছে। আমাদের দেশ জনসংখ্যাধিক। যদি শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারি ও শিক্ষকরা বাজেট বরাদ্দ মোতাবেক দক্ষ-সুশিক্ষিত, টেকনিক্যালি সক্ষম ও সৎ জনসম্পদ জাতিকে দিতে পারতো, তাদেরকে রপ্তানি করে আমরা প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারতাম, দেশেও জনসম্পদ বাড়তো। বৈদেশিক ঋণের চাপ কম পড়তো। অসম্ভব কিছু না। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ তা-ই করছে। আমরা বেতনটা দাবি-দাওয়া করে বাজেটের মাধ্যমে বাড়িয়ে নিতে চাই (যা যৌক্তিকও বটে), কিন্তু অর্পিত মানসম্মত দায়িত্ব পালনে কার্পণ্য করে জনসেবার তুলনায় 'রাজনৈতিক কর্তাভজন'কে অধিক 'সওয়াবের কাজ' ও দায়িত্ব বলে মনে করি। বাজেট-ঘাটতি বাড়ে; দেশ পিছিয়ে যায়। এটা আমাদের সংস্কৃতি।

এদেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা মানে– বিরুদ্ধমত দমন, গ্রেফতার-বাণিজ্য; চাঁদাবাজ-দুর্নীতিবাজ দমন নয়; আইন বিভাগ সে-রকম দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে যাচ্ছে। যুগ যুগ ধরে চাঁদাবাজও চাঁদা আদায়-কর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের কোথায় চাঁদাবাজ নেই! আইন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারিরা বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী দেশকে সেবা দিলে কলা-বিক্রেতা গংয়ের প্রতিদিন 'মস্তানি চাঁদা' গুণতে হতো না, সেবায়ও সিস্টেম-লস হতো না। এদেশে অনেক ছোট-বড় শিল্প গড়ে উঠতো, যারা চাঁদার ভারে পর্যুদস্ত। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জনশক্তি বাজেট বরাদ্দের বিনিময়ে মানসম্মত সেবা দিলে আইনত কর প্রদানযোগ্য ব্যক্তি যথাযথ পরিমাণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর দিতে বাধ্য হতো। সরকারি কোষাগারে অনেক টাকা জমা হতো। বর্তমানে রাজস্ব কর্মকর্তারা করাদায়ে সিস্টেম-লস কমানোর জন্য সহজ বুদ্ধিতে, সহজ পথে আদায়যোগ্য করারোপ করে বোর্ডের মান-সম্মান রক্ষা করছেন, পাশাপাশি ব্যাপক সিস্টেম-লস অব্যাহত আছে। বিদ্যুৎ বিভাগের সেবার দিকে তাকালে দেখা যায়, অবৈধভাবে ব্যাপক রাজস্ব ফাঁকি চলছে। অনভিপ্রেত-অত্যধিক উৎপাদন ব্যয় ও অগ্রহণযোগ্য সিস্টেম-লস ঢাকতে বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। সরকারের সকল বিভাগের 'সর্ব গায়ে ব্যথা'। স্বল্প পরিসরে সে 'গুণকীর্তন' গাওয়া এখানে সম্ভব নয়। জানি, সচেতন মহল সম্যক অবহিত। মূল প্রশ্ন হচ্ছে: সরকারের বাজেটে বরাদ্দকৃত ব্যয়ের কমপক্ষে সমপরিমাণ সেবা ও সম্পদ কি দেশ অর্জন করতে পারছে? প্রতিবছর নীট সম্পদ উদ্বৃত্ত কত? দেশের নীট সম্পদ ঘাটতি

ক্রমশই বাড়ছে। অথচ আমরা মঞ্চ কাঁপিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে রাজনৈতিক বক্তৃতা দিচ্ছি। আসল জায়গায় হাত দিচ্ছিনে। দেশের যে সার্বিক পরিস্থিতি, মুর্শিদ ছাড়া পথের দিশার জন্য আর কে আছে!

এদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ নেই বললেই চলে। যত দুর্যোগ সবই মনুষ্যসৃষ্ট। মনুষ্যসৃষ্ট বোঝা বায়ান্নটা বছর ধরে দেশকে বহন করতে হচ্ছে। 'চাটার দল সব চেটে শেষ করে ফেললো' কথা শুনতে হয়েছে। কেউ রাজনৈতিক দলকে চাটছে, কেউ কেউ চাটছে বাজেট বরাদ্দকে, কেউবা অর্থনীতিকে। দেশটাই হয়ে গেছে 'চাটাচাটির দেশ'। এখান থেকে মুক্তির ব্যবস্থাও আছে। প্রয়োজন সুচিৎসকের ব্যবস্থাপত্র মতো ওষুধ খাওয়া। দেশ তো শুধু রোগাগ্রস্ত ব্যক্তিদের নয়, প্রতিটা নাগরিকের। রোগী ওষুধ না খেতে চাইলে দেশ-হিতাকাঙ্ক্ষীরা ওষুধ খেতে বাধ্য করতে পারেন। আমাদের অনেক দেশ-চালকদের বায়ান্নটা বছরেও অর্ন্তদ্বন্দ্ব, দলীয়স্বার্থান্ধতা, জিভ ঘোরানো-ফেরানো ও দলবাজিই গেল না, তো আমরা দেশ গড়বো কখন! কয়েকজন ধর্মভক্ত দোহারকে এভাবে জারি গানের ধুয়ো ধরতে শুনেছিলাম, 'কালী এবারও ত্বরাইতে হবে ওহে ত্রিনয়না-আ-আ, কালী এবারও'।

(২৫ জুন ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদ এফসিএমএ– অধ্যাপক, ইউআইইউ; গবেষক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ।